মঙ্গলকাব্যের ধারায় ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের স্থান নির্দেশ করো।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরামকে বাদ দিলে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ আর কোনো কবি মধ্যযুগে আবির্ভূত হননি। অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র যখন অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনায় ব্রতী হন, তখন মঙ্গলকাব্য উদ্ভব ও সৃজন যুগ অতিক্রম করে প্রবেশ করেছে ঐশ্বর্য্য যুগে। ভারতচন্দ্রই এই মঙ্গলকাব্য ধারার অন্তিম পর্বের শেষ স্মরণীয় কবি এবং তাঁর অন্নদামঙ্গল শেষ সার্থক মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্য যখন একটা কাব্য রচনা প্রথা হয়ে উঠল, তখন মুকুন্দ সহ সকল কবি নূতন মঙ্গল লিখছেন জানিয়েছেন। অর্থাৎ এরা সকলেই জানতেন কাব্য কাহিনীটি মানুষের কাছে অতি পরিচিত, সেকারণে জীর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই শ্রোতা বা পাঠকের মনোমত করার জন্য মঙ্গলকাব্যের নবীকরণ প্রয়োজন।

ভারতচন্দ্রও বুঝেছিলেন যে অনবরত অনুকরণ ও অনুসরণ করার কারণে জনসাধারণ দেবতার প্রতি ভক্তিতে নয়, ভয়ে মঙ্গল গান শুনছে। কিন্তু সেই ভয়ও ক্রমে সমাজের ভেতর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কারণ কোন দেব-দেবীই ভক্তের আর্থিক- সামাজিক দুর্দশায় সঙ্গী হচ্ছে না। দেবতারা ক্ষমতাশালীর মত নিজের পূজা প্রচারে ছলনার আশ্রয় নিচ্ছেন। আবার দেবতাদের মধ্যে সদ্ভাব নেই। এক দেবতা অন্য দেব পূজারীদের নির্যাতন করছে। তাই প্রয়োজন নতুন দেবীর যিনি অনেক ধন-সম্পদ দিয়ে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। সামান্য অন্নের সংস্থান করে মানুষের প্রাণ বাঁচান। তাই তিনি দেবী অন্নদার কথামালা রচনা করলেন।

ইতিপূর্বে মঙ্গলকাব্যের সমস্ত কবিই দেব-দেবীর দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেছেন বলে জানা যায়। ভারতচন্দ্রই প্রথম মানব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নদামঙ্গল রচনায় ব্রতী হন। অন্নদামঙ্গল কাব্যে তিনটি আখ্যান রয়েছে - ১) অন্নদামঙ্গল ২) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর ৩) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ।

ভারতচন্দ্র ছিলেন সমাজ সচেতন কবি। পূর্বেকার মঙ্গলকাব্যের কবিরা দেব-নির্ভরতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাই তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলো জীবনের সংকটময় অবস্থায় দেবতার কৃপাপ্রার্থী মাত্র। কিন্তু ভারতচন্দ্র ছিলেন পুরুষকারে বিশ্বাসী তাই তাঁর কাব্যের নায়কও সম্পূর্ণ দৈব নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারেননি। তাইতো ঈশ্বরী পাটনী বলেছে -"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। "

Department of Bengali, Rani Bhanya Kumari College

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কাব্য রসই কাব্যের প্রধান উপজীব্য। মঙ্গলকাব্যের কবিরা কেউ কাব্যের বাধা-ধরা পথের বাইরে আসতে পারেননি। শক্তি থাকলেও তাদের সাহস ছিল না। কিন্তু তা করার শক্তি ও সাহস দুই-ই ভারতচন্দ্রের ছিল। ভারতচন্দ্রের এই কাব্য নানা দিক থেকে অভিনব। তাঁর কাব্যের দেবী অন্নপূর্ণা পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মতো ভয়ঙ্কর নন। পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যগুলিতে এক দেবতার স্থানে অপর দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্য বিরোধ দেখা দিয়েছে কিন্তু অন্নদামঙ্গলে তা নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের দেবীর শান্ত স্নিগ্ধ মূর্তি মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছে,ভয়ের উদ্রেক করেনি। ভারতচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে পুরাতন রীতি এখন অচল, মানুষ গ্রাম্য সংকীর্ণতা কাটিয়ে মার্জিত হয়েছে। তাই তিনি প্রচলিত স্থুল গ্রাম্য রসিকতা পরিহার করলেন।

প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলির পয়ার ত্রিপদী ছন্দের একঘেয়েমি কাটিয়ে দেবার জন্য ভারতচন্দ্র নানা সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ব্যবহার করলেন। তিনি তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে যে সমস্ত অলঙ্কার প্রয়োগ করলেন তার মধ্যে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তৎসম,তদ্ভব,দেশী,বিদেশী প্রায় সব রকম শব্দকেই তিনি অকপটে ব্যবহার করেছেন।

আসলে তিনি এক যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রদীপ যেমন নিভে যাওয়ার আগে দপ্ করে জ্বলে ওঠে, মঙ্গলকাব্যও তেমনি ভারতচন্দ্রের হাতে শেষবারের মতো আলোক বিকীরণ করে নিভে গেল।এটি আকৃতিতে মঙ্গলকাব্য, প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র।

Department of Bengali, Rani Dhanya Kumari College